অমর
চিত্র
কথা
নং 309 টা. 3·50
আন্দামানে
বীর সাভারকার

আন্দামানে বীর সাভারকার

১৯০৭ ; লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস, অভিনব ভারতের প্রধান কার্যালয়, যেখান থেকে ...

... বিনায়ক দামোদর সাভারকার ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের পরিচালনা করতেন —

বন্ধু, তোমার জন্য একটি ছোট্ট উপহার!

সুন্দর প্রচ্ছদ! দারুন বাঁধাই!

ইউরোপের মানুষজনের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা জানাতে এবং সে সম্পর্কে সমর্থন আদায় করতে সাভারকার ও তাঁর সহযোগীরা নিরলস ভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন।
এই যে মাদাম কামা! জার্মানী থেকে ফিরেছেন দেখছি! স্টুটগার্টের খবর কি?
আমাদের পরিকল্পনা কত দূর ফলপ্রসূ হলো? ইউরোপীয়রা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে, ভারতীয়রা স্বাধীনতা চায় এবং তা অর্জন করতে তাঁরা মৃত্যুবরণেও প্রস্তুত!
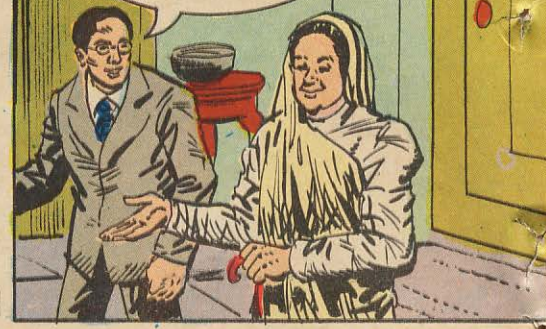
বুঝলেন... ইউরোপের সব প্রান্ত থেকে সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে যোগ দিতে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সম্মেলনে আমি পতাকাটিও উপস্থাপিত করেছিলাম।

এই পতাকা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা... ভারতের স্বাধীনতাকামী যুব-শহীদদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত...
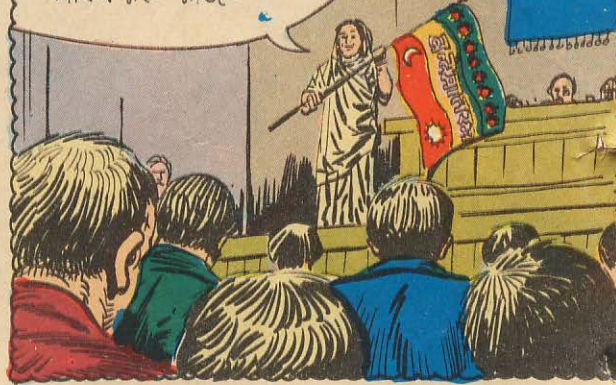
বন্ধুগন, আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, এই পতাকাকে অভিবাদন জানাতে।

এবং কি বলবো সাভারকার, এই কথায় সমগ্র জনতা এক প্রান হয়ে উঠে দাঁড়ালো!

ইংল্যান্ডে সাভারকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা।

বাপট! তুমি ফিরে এসেছো দেখে ভালো লাগছে। তোমার প্যারিস পরিভ্রমন সার্থক হয়েছে তো?

নিশ্চয়ই। আমি বোমা তৈরির কৌশল শিখে এসেছি।

তোমার জন্য একটা বই এনেছি!

BOMB MANUAL

মূল রুশ ভাষায়। আমার জন্য অবশ্য ইংরেজিতে ভাষান্তর করা হয়েছে।

লন্ডনে সাভারকার স্বরাজের পক্ষে এক জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দেন।

... এই প্রস্তাব গ্রহনের আগে আপনারা ভেবে দেখুন জেলের সেই ভয়ঙ্কর প্রাচীর ... অন্ধকার সেলের কথা ...

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

পরে—

সাভারকার, আমাদের একজন সহকর্মীর গতিবিধি কিন্তু বেশ সন্দেহজনক।

সত্যি? কে সেই ব্যক্তি, আয়ার?

কীর্তিকার, সেই যে দন্তশাস্ত্রের ছাত্র!

সে কথা আগে বলো নি কেন?

সেই রাত্রেই সাভারকার ও আয়ার ভারত ভবনে কীর্তিকারের ঘরে গেলেন।

এসো, এসো,
কীর্তিকার!

আমার ঘরে
কী করছো,
আয়ার?
বলছি,
ভেতরে এসো।

এ সবের অর্থ কি?
মানে...
আ...আ...
আমি...

উত্তর
দাও!
কীর্তিকার সব স্বীকার করলো।
গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য
পুলিশই তাকে এখানে রেখেছে।

কীর্তিকার, তোমার কাছে
নিশ্চয়ই প্রানের মায়া
অনেক, তাই নয় কি?
হ্যাঁ!

ঠিক আছে। এবার থেকে তোমার
পাঠানো সংবাদের বয়ান আমরাই
ঠিক করে দেবো। মনে থাকে যেন!
ঠিক
আছে!

সাভারকারের বড় ভাই গণেশরাওকে জেলে পোরা হলো। ভারত থেকে তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ যখন লন্ডনে পৌঁছুলো, তখন মদনলাল ধিংড়া নামে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র বিপ্লবীদের প্রতি সরকারের দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি এর প্রতিশোধের কথা ভাবতে লাগলেন।

সাভারকার, গণেশরাও-এর কি অপরাধ?

দেশাত্মবোধক কবিতার একটি বই ওঁর বেরিয়েছে।

ওঁর একটা কবিতা শুনবে, মদন?

নিশ্চয়ই!

বন্ধু, বলো তো, মুক্তি কখনও যুদ্ধ ছাড়া কি হয়?

ভারত বিষয়ক উপদেষ্টা স্যার কার্জন উইলিকে গুলি করে হত্যা করলেন মদনলাল ধিংড়া।

ধিংড়া আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন।

ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজের অমানবিক অত্যাচার, যথেচ্ছ গ্রেপ্তার এবং যুবকদের ফাঁসি দেবার জন্য আমি বিশ্বের দরবারে প্রতিবাদ জানাতে এই ইংরেজের রক্ত ঝরিয়েছি।

সাভারকার নিগৃহীত হলেন।
ওকে বসিয়ে দাও!
তাড়িয়ে দাও!

মারো!

সাভারকার ধিংড়াকে দোষী বলে মেনে নিতে রাজি হলেন না। অন্য দিকে, কিছু কিছু ছাত্রের মধ্যে অমানবিক আলোচনারও প্রতিবাদে পিছ-পা হলেন না।
দেখলেন, লেডি কার্জন উইলি স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেমন ভাবে কাঁদছিলেন! হা! হা!
এ সব বন্ধ করুন!

একজন মহিলা তাঁর স্বামীর শোকে চোখের জল ফেলছেন। আর আপনারা হাসছেন। লজ্জা হওয়া উচিত আপনাদের।

ইতিমধ্যে ভারতে, নাসিকের ব্রিটিশ কালেক্টর জ্যাকসন, যিনি গনেশরাও সাভারকারকে জেলে পুরে ছিলেন, হঠাৎ আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন।

পুলিশ সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করলো।
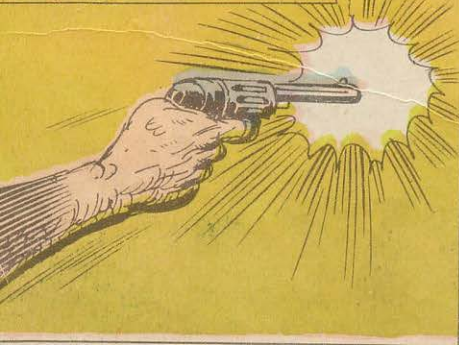
লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে সাভারকারকেও গ্রেপ্তার করা হলো ১৯১০-এর ১৩ই মার্চ ...

... এবং ১৯১০-এর ১লা জুলাই এস.এস. মোরিয়া জাহাজে সাভারকারকে ভারতে চালান দেওয়া হলো।
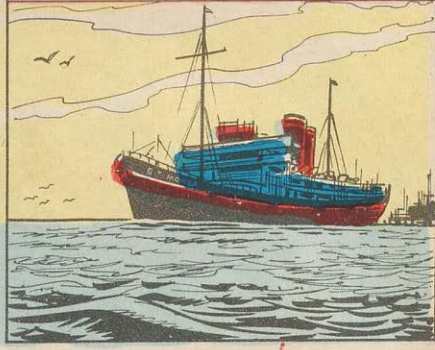
ফরাসী বন্দরে মার্সাইতে দিন দুয়েকের জন্য জাহাজ নোঙর করতে হলো।
এটা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের আশীর্বাদ!

একবার শৌচাগারে যেতে চাই। যাবো?
চলুন আমার সঙ্গে।

প্রহরী সাথে সাথে এগিয়ে যায়।

খুব তাড়াতাড়ি!

সাভারকার নিমেষের মধ্যে তাঁর ড্রেসিং-গাউন খুলে ফেলে, এক লাফে ...
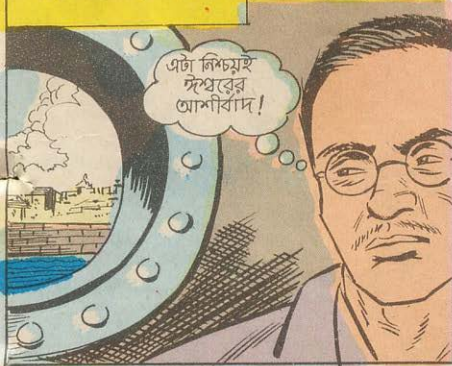
... পোর্টহোল ধরে তার ভেতর দিয়ে গলে ...

... বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এবং সোজা জলে ঝাঁপ দিলেন।

... এক প্রহরী তাঁকে দেখতে পেয়ে ...
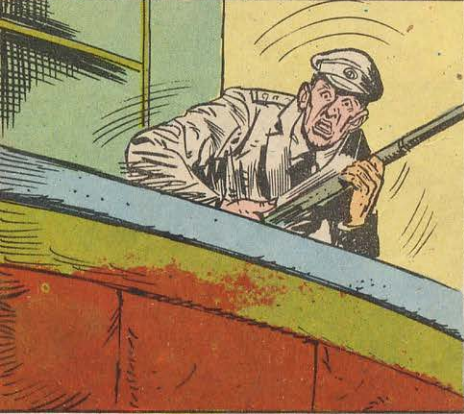
...গুলি চালাতে আরম্ভ করলো।

একবারও পিছনে না তাকিয়ে সাভারকার নির্ভয়ে সাঁতরে চললেন।

এবং এক সময় মার্সাই বন্দরে পৌঁছলেন তিনি।

...বন্দরের মাটি ছুঁতেই—
চোর! চোর!

তোমরা ইংরেজ রক্ষী, আমাকে ধরবার এক্তিয়ার তোমাদের নেই যেহেতু আমি এখন ফরাসী মাটিতে দাঁড়িয়ে!
দেখি কে বাধা দেয় আমাদের!
সাভারকার উপস্থিত ফরাসী পুলিশের কাছেও আবেদন জানালেন। কিন্তু কোনও ফল হলো না।
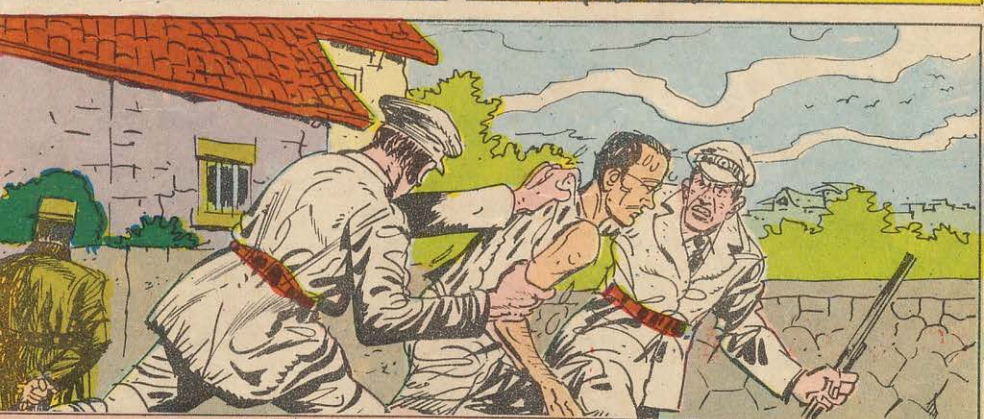
রক্ষীরা সাভারকারকে গ্রেপ্তার করে আবার সেই জাহাজে পাঠিয়ে দিল। সংবাদ পেয়ে মাদাম কামা এবং আয়ার মার্সাইতে ছুটে এলেন। কিন্তু কিছুই করা গেল না।

১৯১০ সালের ২২শে জুলাই সাভারকারকে পুলিশী প্রহরায় ভারতে আনা হলো। বোম্বে হাইকোর্টে এক বিশেষ বিচার সভা অনুষ্ঠিত হলো —
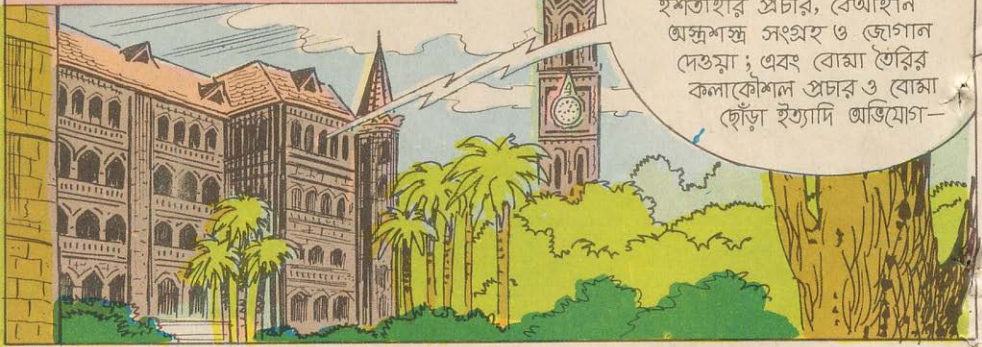
আসামীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের উস্কানি, দেশদ্রোহের মুদ্রিত ইশতাহার প্রচার, বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও জোগান দেওয়া ; এবং বোমা তৈরির কলাকৌশল প্রচার ও বোমা ছোঁড়া ইত্যাদি অভিযোগ—

বিনায়ক দামোদর সাভারকার,— অতএব এই মহামান্য আদালত আপনাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ এবং সেই সঙ্গে আপনার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিচ্ছেন।

নাসিকের কালেক্টর জ্যাকসন হত্যার মামলাতেও সাভারকারকে জড়ানো হলো।

যে পিস্তলে জ্যাকসনকে হত্যা করা হয়েছে তা সাভারকার লন্ডন থেকে পাচার করেছিল।

সাভারকারকে বোম্বের ডোংরি জেলে নিয়ে যাওয়া হলো।
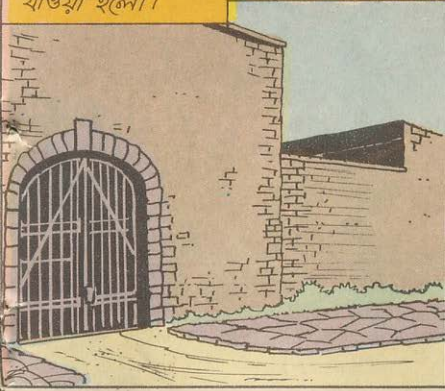
ফরাসী মাটিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে কোনও কোনও ফরাসী সংবাদপত্র ফ্রান্সের হাতে সাভারকারকে তুলে দেবার জন্য জোর দাবি জানিয়েছিলেন। এক আন্তর্জাতিক আদালতে তার শুনানি হলো। সাভারকার ডোংরিতে তার রায়ের অপেক্ষায় রইলেন।
মিঃ সাভারকার, খুবই দুঃসংবাদ!

আন্তর্জাতিক আদালত ব্রিটেনের পক্ষে রায় দিয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড মানে পঁচিশ বছর আন্দামানে কাটাতে হবে। আর আপনার ক্ষেত্রে দ্বিগুণ সাজা; অর্থাৎ মোট পঞ্চাশ বছর কারাদন্ড ভোগ করতে হবে।

লোহার এই চাক্‌তিটা পরতে হবে আপনাকে।
3C
121, 121A
109, 302
50 YEARS
24.12.1910
D
23.12.1960

ব্রিটিশ শাসন তাহলে আর পঞ্চাশ বছর টিঁকে থাকছে?
আর কোনও বিপ্লবীকে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখা যায় নি।

পরে তাঁর স্ত্রীকে দেখা করতে দেওয়া হলো।

আমাকে চিনতে পারছো না বুঝি?

শুধু পোশাকটা বদলে গেছে। মানুষটা কিন্তু সেই একই।

সাভারকারকে বাইকুল্লা জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। পরে সেখান থেকে থানে জেলে। এক বন্ধু ওয়ার্ডার তাঁকে খবর দিলেন—

তাঁর ছোট ভাই নারায়ণরাওকে বড় লাটের প্রাণনাশের চেষ্টার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আন্দামানে নিয়ে যাবার জন্য বন্দীদের জেলের বাইরে আনা হলো।
চলো, এবার আমাদের আন্দামানের পথে যাত্রা করতে হবে।

সাভারকারকে গাড়িতে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো।

ও বুঝি রাজা? ওকে যে গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে?
ওকেই যে সরকার সব চেয়ে বেশি ভয় করে!

সাভারকারের পায়ে বেড়ি ছিল। আর তাঁর হাত ছিল এক অফিসারের হাতের সঙ্গে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা।
বন্ধু, আপনার জন্য দুঃখ লাগছে! এই মুহূর্তে আপনিও আমারই মতো বন্দী!

তাতে ক্ষতি নেই। শুধু অনুরোধ মার্সাই-র মতো পালাবার চেষ্টা করবেন না!
তা করবো না!

মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে থানে থেকে ট্রেন ছাড়লো।
বিদ্যুত বেগে ট্রেনটা আমাদের আন্দামানের পথে দ্রুত ঠেলে দিচ্ছে।

আবার একই গতিতে জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবে তো?

মাদ্রাজ থেকে এস.এস. মহারাজা জাহাজে সাভারকার ও অন্যান্য বন্দীদের আন্দামানে পাঠানো হলো।
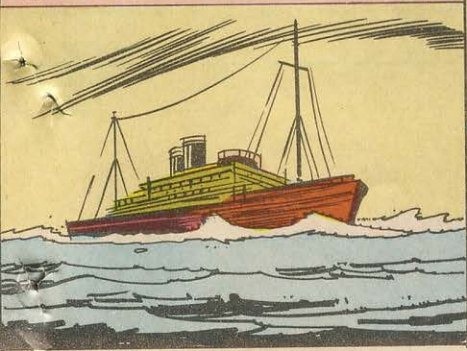
১৯১১ সালের ৪ঠা জুলাই জাহাজ আন্দামানের পোর্ট-ব্লেয়ারে পৌঁছুলো।

আন্দামান! বঙ্গোপসাগরের প্রবেশদ্বার! ভারত স্বাধীন হলে প্রতিরক্ষার দিক থেকে এখানে এক আদর্শ নৌ-ঘাঁটি গড়ে তোলা যেতে পারে।

সাভারকারের স্বপ্ন পরবর্তী কালে সত্য হয়েছিল। বর্তমানে আন্দামানে ভারতের এক শক্তিশালী নৌ-কেন্দ্র বিদ্যমান।

জেলের কাছাকাছি এগিয়ে যাবার পথে—

যে বন্ধুর পথ ধরে তোমরা জেলখানার দিকে এগিয়ে চলেছো...

মিঃ ব্যারী ছিলেন সেখানকার জেলার।
মার্সাই থেকে তুমিই বুঝি পালিয়ে ছিলে?
হ্যাঁ!

কেন পালিয়েছিলে?
নিজেকে মুক্ত করতে।

নিজের মঙ্গলের জন্য এমন কাজ আর করতে যেও না। আন্দামান জেলের চার দিকে গভীর অরণ্য। আর এই অরণ্যে বাস করে হিংস্র জংলীর দল, যারা সত্যি সত্যিই নরখাদক!

একবার ধরতে পারলে, তোমাকে মেরে কাঁচা খেয়ে ফেলবে!
আমি জানি, পোর্ট ব্লেয়ার আর যাই হোক, মার্সাই নয়!

ওকে কুঠুরিতে নিয়ে যাও!

প্রথম পনেরো দিন সাভারকারকে এক নির্জনতম সেলে রাখা হলো।
7
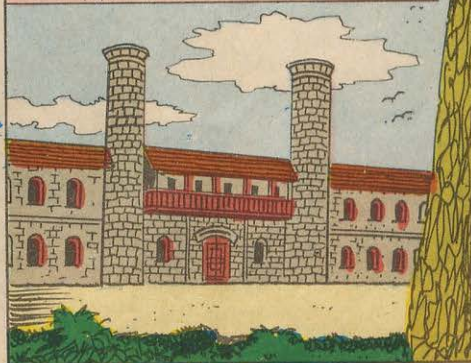
একটা কুঠার ও একটা কাঠের বড় হাতুড়ি দিয়ে প্রথমে তাঁকে নারকেল গাছ কাটতে দেওয়া হলো।
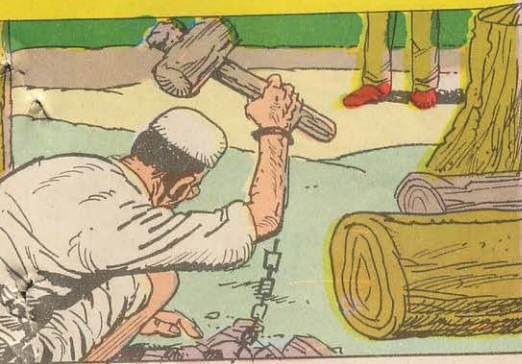
সাভারকার, তোমার পদোন্নতি ঘটানো হলো। এবার থেকে তুমি তেল-কলে কাজ করবে।

তেলের ঘানি টানার কাজ নিদারুণ পরিশ্রমসাধ্য —

অচিরেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন।
জল!
জল!

এক জন বন্দীর সারা দিনে দু'কাপ জল বরাদ্দ। তুমি ইতিমধ্যেই তিন কাপ পেয়ে গেছো। আবার চাইছো!!!

এক্ষুনি উঠে কাজে হাত লাগাও!
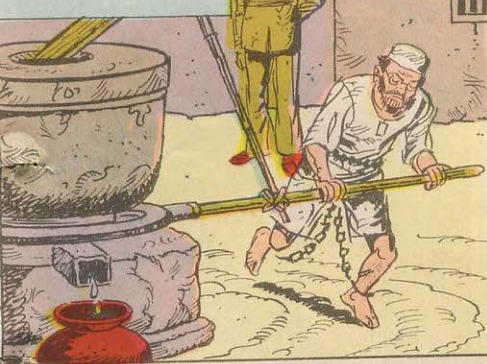
খাবার সময় হলেই সাভারকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়তেন

কিন্তু দু'তিন গ্রাস মুখে তুলতে না তুলতেই —
এখনও শেষ হয় নি? জলদি! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো!

এতো টুকু বিশ্রাম না নিয়েই সকলকে আবার তেল-কলের কাজে ফিরে আসতে হতো —
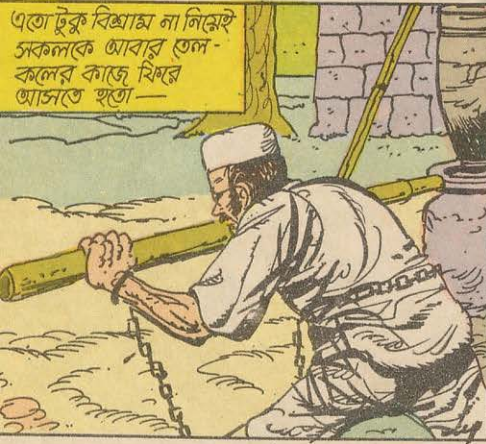
সন্ধ্যায় —
এখনও তোমার কোটা অনুযায়ী তেল বের হয় নি!

রাতে আহারের পরেও তোমাকে কাজ করতে হবে।

রাতের বেলাতেও বন্দীদের ঘানি টানতে হতো। জেলার তখন ঘুমে ঢুলে ঢুলে নাক ডাকতো।

সাভারকারকে বছরে একটি চিঠি পাবার ও লেখার অনুমতি আন্দামানে দেওয়া হয়েছিল। ছোট ভাই ডাঃ এন. ডি. সাভারকারকে লেখা তার একটি এখানে দেওয়া হলো—

সেলুলার জেল
৯-৩-১৯১৫
পোর্ট ব্লেয়ার

স্নেহের ভাই,

সাত-আট মাস আগে তোমার লেখা চিঠির উত্তর দিতে বসেছি। তোমার একটি চিঠি পাওয়া তোমাকে দেখতে পাওয়ারই সমান।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সমস্তই অন্যান্য বছরের মতই একই ধারায় চলেছে। জেলখানায় প্রথম দিনের মতোই অন্যান্য দিনগুলিও কেটে যায় — যদি না চরম কিছু ঘটে। জেলে নতুনত্বের স্বাদ খুঁজতে যাওয়া বোকামি। যাদুঘরে দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র যেমন লেবেল সেঁটে সাজিয়ে রাখা হয়, আমাদেরও সেই রকম মার্কা মেরে বোতলে রাখা হয়েছে।

আগেকার চিঠি থেকেই আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটা ধারনা নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবে। আমরা যথারীতি সকালে উঠি, কাজ করি, যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে খাই। ঠিক সময়ে, ঠিক স্থানে, জেলখানার তথাকথিত স্বাস্থ্যসম্মত একই খাবার একই ভাবে পরিবেশন করা হয়। বন্দীদের কোনও ইচ্ছেরই মূল্য এখানে নেই। তবে জেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, বন্দীদের ইচ্ছে মতন স্বপ্ন দেখার উপর তারা কোনও হস্তক্ষেপ করেন নি। বন্দীরা ইচ্ছে মতন স্বপ্ন দেখতে পারে। এবং আমি এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে থাকি। প্রতি রাত্রেই আমি জেল ভেঙে মাঠে ঘাটে, পাহাড়ে পর্বতে, শহরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াই। ততক্ষণ ঘুরে বেড়াই যতক্ষণ না তোমাদের একজনকে খুঁজে না পাই— আমার বুকের মধ্যে তোমরা যারা রয়েছো। প্রতি রাত্রেই আমি এই কান্ড করে থাকি। কিন্তু কি আশ্চর্য, সদা সতর্ক জেল-কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানতে পারে না। জেলে জেগে থাকাটাই ওরা বোঝে শুধু।

ইতি
তোমার দাদা
তাত্তা।

এক দিন ঘানি টানতে টানতে —

এ সব বন্ধ করতে হবে! বেঁচে থেকে আর কি লাভ? বরং মৃত্যুই এখন সম্মানের।

আত্মহত্যার কথাও তিনি ভাবতে লাগলেন। কিন্তু যুক্তি শেষ পর্যন্ত তা রোধ করলো।

এই নিদারুন অত্যাচার সহ্য করা তো দেশেরই একটা কাজ। বরং বেঁচে থেকে দেশের জন্য আরও কঠোর সংগ্রাম করতে হবে।

কিন্তু সকলে সাভারকার নন। ইন্দুভূষন আত্মহত্যা করলেন। উল্লাসকর দত্ত উম্মাদ হয়ে গেলেন। আর সামান্য ভালো কথা শুনলেই উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তো কান্নায় ভেঙে পড়তেন।

উপর অবর্ণনীয় নানা রকম অত্যাচার চলতে লাগলো।

শিকল দিয়ে বাঁধা হতো...

...হাত পিছনে রেখে হাতকড়া...
... কোমরে লোহার বেড়, যাতে নিচু হওয়া না যায়...

...দু'পা লোহার শিক দিয়ে বাঁধা হতো, যাতে দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে বা হাঁটার সময়ও পা ফাঁক করে থাকতে হয়...

...এমন কি কোনও দেয়ালে তাঁর হাত দুটিকে কড়ার সাথে বেঁধে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হতো।
এই সব অসহনীয় অত্যাচারে তিনি মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তাঁর ওজন গেল কমে। তবু তিনি মনের জোরে সব কিছু সহ্য করতেন। কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করতেন।
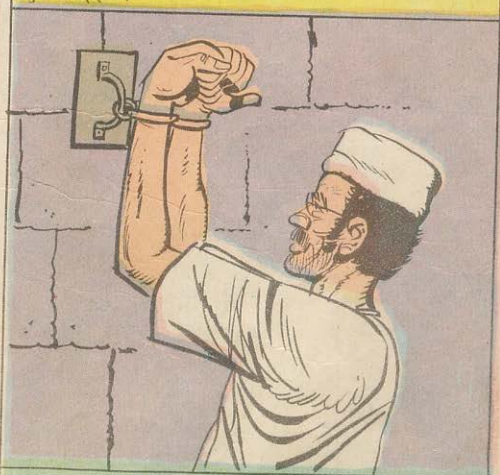
সাভারকার জানতে পারলেন, তাঁর দাদা গণেশরাও-ও এখানেই জেল খাটছেন।

স্যর, আমার দাদার সঙ্গে দেখা করতে চাই?

তোমার দাদা এখানে যে আছে, সেটা কে বলেছে?
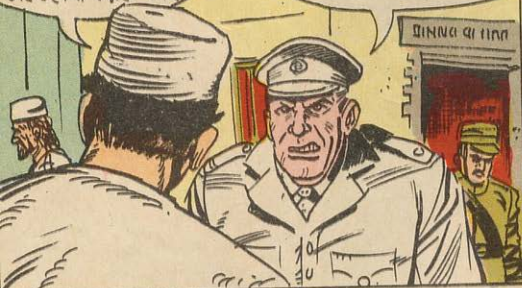
অবশেষে এক দয়ালু জমাদার তাঁকে সাহায্য করলেন।

এখনই আপনার দাদার ব্যাচের হাজিরা ডাকা হবে। তারপর আপনাদের পালা!

প্রথম দলের পর দ্বিতীয় দল যখন হাজিরা দিতে এগিয়ে চলেছে—

তাত্যা! তুমি এখানে?

ভাইও এখানে বন্দী জেনে গণেশরাও অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।
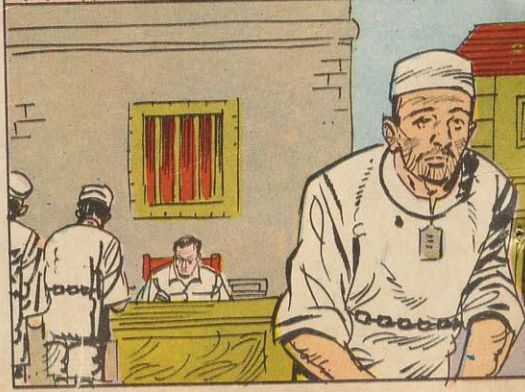
এক অনুগত জমাদার মারফত তাঁর দাদার কাছ থেকে একটি চিঠি পরে সাভারকার পেলেন।
আমার ধারণা ছিল, তোমরা ওখানে থেকে দেশের কাজ ... ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে চলেছো। আমার এই দন্ডের জন্য আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করি না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তুমিও এখানে!
সাভারকার উত্তর দিলেন—
এখানেই আমাদের পচে মরতে হবে ... মাতৃভুমির চরনে শুধু ব্যর্থতার অঞ্জলিই নিবেদন করলাম আমরা। বাকি যাঁরা তাঁরা এখন সাফল্য এনে দিক...
সাভারকার সেজন্য বন্দীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মন দিলেন।
কিন্তু সাভারকার, আমার মনে হয়, বেশি জ্ঞান অর্জন করে কিছু হবে না... আমি লড়াইয়ে বিশ্বাস করি।
বোমা ছুঁড়তে বলো, আমি এক কথায় রাজি। কিন্তু বই পড়তে বললে, ছুট্টে পালাবো!
জেলের বাইরে তো স্বাধীনতার জন্যে লড়েছেন।
এখন জেলের ভিতরে আপনারা নিজেদের তৈরি করতে থাকুন স্বাধীনতার পরবর্তী মহান দায়িত্ব গ্রহন করার জন্য।
সাভারকারের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না যে, ভারত একদিন স্বাধীনতা লাভ করবেই।
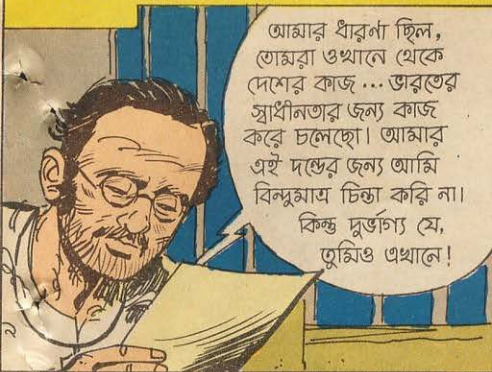
দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন আমাদের অর্থনীতিবিদ, শাসক এবং রাজনীতিবিদদের প্রয়োজন হবে।
ঠিক কথা। কিন্তু বই কোথায়?
আর কাগজ কলমই-বা কে দেবে?
আমরা বই সংগ্রহের চেষ্টা করবো। আপাতত জেলের দেয়ালে সেই কাজ চলুক।
জেলের দেয়াল?
বন্ধুগন, কাল আমাদের সেল বদলের দিন। সাত নম্বর সেলে যিনিই বদলি হোন, দেয়ালের দিকে তাকাবেন।
পরের দিন এক বন্দী সাত নম্বর সেলে বদলি হয়ে এসে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অবাক।
ভগবান! এ যে লেখায় লেখায় ভর্তি!
সাভারকার ইতিমধ্যে গনতন্ত্রের প্রধান সূত্রগুলি দেয়ালে লিখে ফেললেন।

এক নতুন বন্দীকে আন্দামানে আনা হলো। ভারাক্রান্ত মনে তিনি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—

তোমার জন্য মৃত্যুই জীবন,
তোমাকে ছাড়া এই জীবন মৃত্যুর সমান।

অন্য সেলে সরিয়ে দেবার আগে সাভারকার ভারত মাতাকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি লেখেন।

মাতৃভূমি জননী, এই পৃথিবীতে কার এতো সাহস, তোমাকে অপমান করে?
তার রক্তে আমরা তোমাকে স্নান করাবো।

ননীগোপাল রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। তিনি কোনও কথার জবাব দিলেন না। এমন কি শাস্তি পাবার সময়ে গায়ে জামাটি পর্যন্ত রাখলেন না।
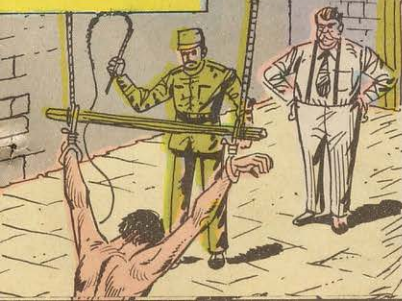
কিছু বন্দী ইতিমধ্যে এই নির্যাতন সম্পর্কে কিছু চিঠি গোপনে পাচার করেছিল। এবং তা বাইরের সংবাদপত্রগুলিতেও প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদের গুরুত্ব সরকারকেও বিচলিত করলো।

সাভারকার, স্যর রেগিনাল্ড ক্রেডক কারা পরিদর্শনে আসছেন।

বড্ড দেরিতে আসছেন তিনি!

ক্রেডক জেল পরিদর্শন করলেন এবং পরে সাভারকারের সঙ্গে কথা বললেন।

মিঃ সাভারকার, আপনি আমাদের যা-ই ভাবুন, তবু জানবেন, আমরা অনেক বেশি সদয়। আপনাদের রাজা-রাজড়াদের আমল হলে রাজদ্রোহীদের তাঁরা হাতির পায়ের তলায় ফেলে মেরে ফেলতেন!

ভুলে যাবেন না, সে আমলে ইংল্যান্ডেও সামান্য চুরির অপরাধে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হতো।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বিদ্রোহীদের হাতির তলায় ফেলে তখন শাস্তি দেওয়া হতো, তবে বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করলে রাজার মাথাটাকেও খোয়াতে হতো — আপনাদের রাজা প্রথম চার্লসের ভাগ্যে যা ঘটেছিল।

ক্রেডক চলে গেলেন। ননীগোপালও অনশন চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ননীগোপাল মৃত্যু মুখে। ওঁর অনশন ভঙ্গ করার একটি মাত্র পথ খোলা আছে।

সাভারকারও অনশন শুরু করলেন।

সাভারকার, তুমি আমার জন্য অনশন করছো দেখে নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হচ্ছে!

ঠিক আছে, ননী, তুমি যদি অনশন ভঙ্গ করো তাহলে আমিও খেতে পারি।

যদি মরতেই হয়, বীরের মতো মরো।

যতো পারো খাবার নিয়ে খাও। মোটা হও। কিন্তু কোনও কাজ করো না।
ননীগোপাল অনশন ভঙ্গ করলেন। সেই সঙ্গে বন্দীরাও কাজ করা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা তেল-কলে ঘৃনিত কাজ করতে অস্বীকৃত হলেন।

অতঃপর সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে বন্দীদের সাজা কমিয়ে দিলেন।
সাভারকার, যাঁরা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করছিল, তাঁদের তাহলে ১৪ বছর আন্দামানে কাটাতে হচ্ছে!

সাভারকার হাসলেন।
আমার ক্ষেত্রে আঠাশ বছর! আমি দ্বিগুন সাজা খাটছি!
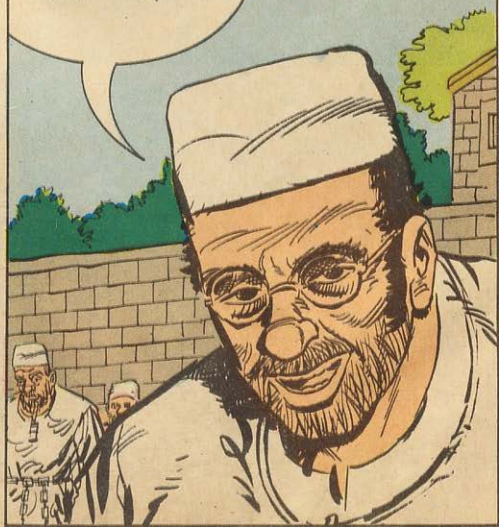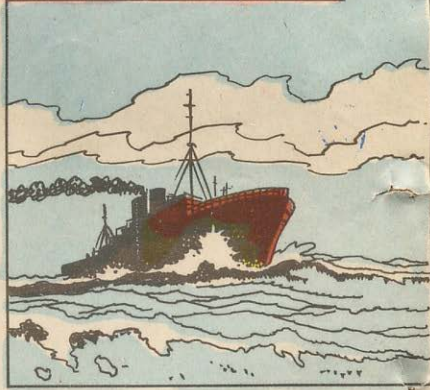
ভারত সরকার সাভারকারকে 'ভারতের শান্তির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি" বলে মনে করতো এবং সেজন্য তাঁকে রত্নগিরিতে নজরবন্দী রেখেছিল। ১৯৩৭ সালে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়। সাভারকার স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়ভাবে লড়াই করেছেন। সুখের কথা, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি স্বাধীন ভারতের তে-রঙা পতাকা উড়তে দেখে গেছেন।